প্রদীপ ও পতঙ্গ
মূল বোড়ো গল্প: সিলিংখার
লেখক: নীলকমল ব্রহ্ম
অনুবাদ: ড. রাজীব সাহা

শিলঙের পাইনউড হোটেলে আমি একজন বোড়ো ছেলে পেয়েছিলাম। রঙে-রূপে বোড়ো বলা কঠিন ছিল। চাপা রঙের ঘন দাড়িওয়ালা বক্সার মহম্মদ আলী অথবা কেসিয়াস ক্লের মতো চেহারা ছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সে বিহারী। সেন্ট পিটার্স স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করাতে যাওয়ার সময় বোড়োতে কথা বলতে শুনে সে নিজেই আমার সামনে এসে কথা বলতে থাকে।

'আপনি কি শিলঙে কাজ করেন বাবু?'

এটাও কি কোনো জিজ্ঞেস কারার কথা হল। শিলঙে কাজ করা ব্যক্তি পাইনউড হোটেলে কেন উঠবে এটা তার জানার দরকার ছিল। তবুও আমি অন্য কিছু ভেবে উত্তর দিলাম।

'না ভাই। কাজে এসেছি। দুদিন থাকব আমি।'

কথায় বলে অচেনা জায়গায় অচেনা লোককে ভরসা করতে নেই। আমি এই মানুষটির সঙ্গে আরও কথা বলার রাস্তা একবারেই বন্ধ করে দেই।

কথা কিন্তু শেষ হয়নি। মাগুরাম মুংনি নামে সেই বোড়ো ছেলেটির নজর থেকে আমি বাঁচতে চেয়েও বাঁচতে পারিনি। নাহলে এই গল্পটি আমাকে লিখতে হতো না।

ছেলেকে সেন্ট পিটার্স বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের হাতে সমঝে দিয়ে আমি যখন মাঠে পৌঁছুলাম তখন দেখতে পাই খাকি ইউনিফর্ম পড়ে মাগুরাম সেন্ট পিটার্স বিদ্যালয়ের বচ্চাদের খেলা দেখছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখানে?'

'বাচ্চাদের এখানে ছাড়তে আসি আমি বাবু। অফিসারদের বাচ্চা।' সে জবাব দেয়।

আমার বেশি কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। ডনবস্কো পয়েন্টে সিটি বাস ধরে আমি চীফ কনজারভেটর অফ ফরেস্টের অফিসে পৌঁছাই। চীফ কনজারভেটর রঙ্গনাথন সাহেব কলিং বেল বাজিয়ে যাকে কফি আনতে বলেন সেই মানুষটি অন্য কেউ নয়, যাকে আমি সেন্ট

পিটার্স বিদ্যালয়ের কাছে ছেড়ে এসে ছিলাম, যাকে আমি গতকাল সন্ধ্যাবেলা পাইনউড হোটেলে দেখেছিলাম— সেই মাগুরাম।

আমি বুঝতেই পারছিলাম না কথাটা কি ছিল। যেখানেই আমি যাই মাগুরাম আমার পেছনে কেন পড়েছে? হোটেলে গেলেও মাগুরাম, মাগুরামের কি কোন কারাপ উদ্দেশ্য রয়েছে? স্পাই বা সিআইডি নয়তো মাগুরাম?

ড্রীমল্যান্ডে ফার্স শো সিনেমা দেখে আমি পাইনউড হোটেলে দুদিনের জন্য রিজার্ভ করা সুইটে ঢুকলাম। কাপড় বদলে আমি ডাইনিঙে চলে গেলাম। সেই সময়েও মাগুরাম হাজির। পায়ে বিনা পালিশ করা বুট, গায়ে পুরনো ওভার কোট। মাথায় উলের মাংকি ক্যাপ পরা। হাতে বড় একটি লাঠি।

'বাবু এখন আসলেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

আমি জবাব দিতে চাইনি। মাগুরামকে আমি কোনভাবেই ভরসা করতে পারি নাই। এখন পর্যন্ত মাগুরাম আমাকে কোন রকম ক্ষতি করেনি, তবুও আমার মন মাগুরামকে সহজভাবে নিতে পারছে না। সিনেমা দেখছিলাম বলে আমি ডাইনিং হলে চলে গিয়েছিলাম।

সেদিন আমি রাতে ভাল করে শুতে পারিনি। বারান্দায় বুটের খট্ খট্ শব্দ ও ছড়ির ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে আমি একবার বাইরে বেরিয়েছিলাম। দরজায় সেই মাগুরাম দাঁড়িয়েছিল। এইবার আমি মাগুরামকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না—

—'তুমি কি এখনও আছো ভাই?' আমার 'ভাই' শব্দের মধ্যে কোন প্রেম ভাবনা ছিল না, সেখানে শাসনের সংকেত ছিল। মাগুরামের আমার কাছ থেকে চলে যাওয়া প্রয়োজন।

'আমি এখানে সকাল পর্যন্ত থাকবো বাবু। এই হোটেলের রাতের চৌকিদার আমি।' সে জবাব দেয়।

কথাটা ঠিক হলেও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। যে এক সরকারি হোটেলের আরদালী সে আবার একটি সরকারি হোটেলের রাতের চৌকিদার কেমন করে হতে পারে। তার কি ক্লান্তি নেই, ঘুম আসে না? ধীরে ধীরে সেই মানুষটির সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার মনে বেশি করে ভর্তি হতে থাকে। আমি তাকে সুইটে আসতে বললাম। আমি তাকে একটি টুল এগিয়ে দিই বসার জন্য।

বসে কি না বসে করে সে দরজার সামতে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে— 'এই হোটেলে আমার কাজ করা পাঁচ বছর হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কোন বাবু আমাকে এভাবে ভেতরে ডেকে বসায়নি। কিন্তু আজ আপনি...।'

কথাটা সে শেষ করতে পারেনি। পেছন থেকে তার গলায় যেন ফাঁস লেগেছিল। সে তার চেহারা লুকিয়ে নিয়েছিল।

আমি জোর করে বসতে বলায় সে টুলকে নিজের সামনে টেনে এনে দরজার কাছে বসে যায়। বাইরে শিলঙের ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পাইন পাতার শির শির শব্দ রাতের শিলঙকে পাহারা দিচ্ছিল।

তার দিকে তাকিয়ে আমি কথা শুরু করলাম, আচ্ছা ভাই তুমি কে?

আমার সেই কথায় ঘুমের ভাব লাগার মতো ব্যক্তি হঠাৎ সোজা হয়ে উত্তর দেয়, 'আমি মাগুরাম'।

'শিলঙে তুমি কেমন করে এসেছ?'

আমার কথার জবাবে মাগুরাম দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মাগুরাম শুরু থেকে বলে যে সে কেন শিলঙে কেন এসেছে, কীভাবে এসেছে। মাগুরামের কথা যখন শেষ হয় তখন আমার এমন ঘুম পায় যে শত চেষ্টা করেও চোখ খোলা রাখতে পারিনি।

শেষে মাগুরাম আমাকে বলে যে তার জীবনের কাহিনি যাতে কারও সামনে প্রকাশ না করি। মাগুরাম ভাবে এই বিশাল দুনিয়ায় তার মতো নির্বোধ কেউ নেই যে জীবন সংঘর্ষে সাহায্য করে।

পরদিন সকালেই আমি পাইনউড হোটেল ও শিলঙ ছেড়ে দিই। বাড়ি ফিরে এসে আমি ভাবি মাগুরামের জীবন কাহিনি নিয়ে একটি গল্প লেখা যায়।

বলতে গেলে, মাগুরামের জীবনের গাথাই একটি কাহিনি। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জেতার আশা মনে নিয়ে সে নিজের গ্রাম, মা ও বাড়ি ছেড়ে এই বিশাল দুনিয়ায় এসে গিয়েছিল। বেশি জমির লোভ ছিল না তবুও মাগুরাম নিজের মায়ের প্রতি ভালবাসা ও নিজের শরীরের শক্তি ওপর ভরসা করে গ্রামে না গিয়ে থাকতে পেরেছিল।

ছেলে বয়সে সকলেরই একবার না একবার রোমান্সের অনুভব হয়। এই বয়েস খুব ঠকায়। এই বয়সের প্রভাবে মানুষ নিজের কাছে কি আছে কি নেই তার অনুমান করতে পারে না। ঘটনার প্রভাবও পড়ে এই বয়সে। এই বয়সে নিজে অজানা কিছু ঘটনার সঙ্গে জুড়ে যায়।

এই রকম একটি ঘটনা মাগুরামের মনের মধ্যে রোমাঞ্চের মন্দির বানিয়ে দিয়েছিল। জীবনকে ভাল করে জানার ইচ্ছা। সংসার ধর্মের সঙ্গে মিলে জীবনের নির্ণয়কে পুরো করার ইচ্ছা।

আজ মাগুরাম ভাবে, সেই বন্যা গ্রামে না হলে তার এই দুর্দশা হতো না। বন্যা হয়েছিল, বন্যায় মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু সেই বন্যায় বানাশ্রীকে না ডোবালে ভাল হতো।

গাঁওবুড়ার মেয়ে মান্দারীর বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিল যখন হঠাৎ আসা বন্যায় বয়ে যায়। সেই সময় মাগুরাম কাছে না থাকলে মান্দারীর কি হতো বলা যায় না। নিজের জীবনের

মায়াকে ত্যাগ করে জলে ঝাঁপিয়ে মান্দারীকে বাঁচিয়েছে। সকলেই মাগুরামকে ধন্যবাদ দেয়। মান্দারীর নাম বদলে হয় বানাশ্রী।

এই ধরণের ঘটনা মানুষের জীবনে এক নতুন সংঙ্কেত নিয়ে আসে। বানাশ্রীর মাগুরামকে জীবনের দেবতা হিসাবে চিরদিনের জন্য সম্মান দিতে একটু সময় লেগেছিল।

মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবসময় পূরণ হয় না। মানুষের চাহিদা পূরণের রাস্তা সোজা নয়। গ্রামের গাওঁবুড়ার মেয়ে বানাশ্রীকে তার ছেলের বউ হিসাবে নিয়ে আসতে তার বিধবা মায়ের কোন খেদ নেই। কিন্তু বানাশ্রীর বাবা গাওঁবুড়া মাগুরাম-বানাশ্রীর এক হওয়ার পথে বাধাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিঃসম্বল দরিদ্র মাগুরামকে যে মহাজন গাওঁবুড়া নিজের আদরের মেয়েকে দিতে চায় না সেটা ভাল করে সে জানত।

জোয়ান মাগুরাম নিজের প্রেমিকার পৃথিবীতে পা রেখেছে। প্রেরণা বানাশ্রী। বানাশ্রীকে পাওয়ার জন্য মাগুরামকে তার বাবার গ্রামের গাওঁবুড়ার সম্মুখে প্রমাণ দিতে হবে যে মাগুরাম নেহাৎ গরীব নয় বানাশ্রীকে কখনও ক্ষুধার্ত রাখবে না। এর জন্য তাকে সংঘর্ষ করতে হবে, ঘর-বাড়ি বানাতে হবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বাইরের দুনিয়া অনেক বড়। মাগুরামের মতো মানুষ সেখানে রাস্তার সন্ধান করতে পারে না। কেবল শারীরিক শক্তি দিয়েই মানুষ এই দুনিয়ায় সফল হতে পারে না। বরং শারীরিক শক্তির বাইরে অন্য মামলাতেও মাগুরাম অনেক দুর্বল।

কপাল গুনে মাগুরাম একজন এম. এল. এ-র খাবার বানানোর কাজ পায়। সেই এম. এল. এ তাকে নিজে মন্ত্রী হওয়ার পর শিলঙে নিয়ে আসে। শেষে তিনি কৃপা করে চীফ্ কনজারভেটর অফ ফরেস্টের অফিসে আর্দালির কাজে লাগিয়ে দেয়।

কিন্তু তাতে মাগুরামের বড় লক্ষ্য মাটি, ধন-সম্পত্তি, ঘর বানানোর ইচ্ছা পূরণ হবে না। মাগুরামের কপাল সাথ দেয়। মন্ত্রীর কথায় মাগুরাম পাইনউড হোটেলে রাতের দারোয়ানের পদও পায়। কিন্তু মাগুরাম এতেও সন্তুষ্ট হয়নি। সকালে অফিসে যাওয়ার আগে সে তিনজন অফিসারে মেয়ে-ছেলেদের সেন্ট পিটার্স স্কুল ও লরেটো কন্ভেন্ট স্কুলে ছেড়ে আসে।

মাগুরামকে আজ যদি বলি নেহাৎ গরীব বলা যায় না। মাগুরামের এখন গাওঁবুড়ার সামনে গিয়ে তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার শক্তি আছে। সেইজন্য আমি বলছিলাম—

> "সেখানে শুধু টাকা কামালে হবে না, শরীরের ধ্যানও রাখতে হবে। তুমি যেমন ভাবে সারাদিন কাজ করতে থাক, তোমার একটু আরামেরও প্রয়োজন আছে। এভাবে তুমি একটুও আরাম না কর তবে কতক্ষণ নিজের শরীরকে সামলাতে পারবে? যদি শরীর চলে যায় তো টাকা দিয়ে কি করবে?"

‘কথাটাতো ঠিক বাবু। আমি সেই কারণে আগামী বছর গ্রামে যেতে চাইছি— মন্ত্রী সাহেবের ইলেকশনের সময়। গতকালই বানাশ্রীর বৌদি খবর দিয়েছিল। বানাশ্রী আর অপেক্ষা করতে পারছে না!’

আমি মাগুরামকে মনে মনে প্রশংসা করলাম। প্রশংসা করলাম তার জীবন সংঘর্ষকে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি— মাগুরামের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হোক।

আমি ঠান্ডার ছুটিতে ছেলে মেয়েদের আনতে গিয়েছিলাম। হোটেলে কিন্তু থাকার কথা ছিল না। একদিনেই বাচ্চাদের নিয়ে আসার প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু চীফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট রঙ্গনাথন সাহেব রাস্তায় দেখে আমাকে নিজের এক পার্টিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব জোর করেন তাই আমাকে রাতে থাকতে হয়। রঙ্গনাথন সাহেব ফোনে আমার জন্য পাইনউড হোটেলের একটি সুইট রিজার্ভ করেন। পার্টির পর রঙ্গনাথন সাহেবের গাড়িতে যখন আমি পাইনউড হোটেলে পৌঁছাই তখন রাতের মেয়েরা ছিল না।

আমি ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। বাইরে থেকে বুটের খ্রব্-খ্রব্ ও লাঠির ঠক্-ঠক্ শব্দ সুইটের দিকে আসতে শুনলাম। সেখানে কি মাগুরাম ছিল? আমি ভাবলাম। কিন্তু মাগুরামতো ইলেকশনের সময় গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিল! আমি জানি যে মন্ত্রী সাহেব মাগুরামকে ইলেকশনের সময় শিলঙে এনেছিলেন গত নির্বাচনে তার পরাজয় হয়েছিল।

বুট ও ছড়ির আওয়াজ আমার সুইটের কাছে এলে আমি দরজা খুলি। হ্যাঁ মাগুরামই ছিল। মাগুরাম থেমে আমার দিকে দেখছিল। আমি তাকে দেখে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলাম সেও আমাকে দেখে তেমনই আশ্চর্য হয়েছিল।
‘বাবু আপনি?’ হঠাৎ তার মুখ থেকে বের হয়।
‘তুমি এখনও আছো ভাই?’ আমি বললাম।

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মাগুরাম দীর্ঘশ্বাস নেয় ও বলে যে সে তার জীবনের সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে।

বানাশ্রীর বিয়ে হয়ে গেছে। নিজেরই ঘরের কর্মচারীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। পাঁচবছর অপেক্ষা করেছিল বানাশ্রী। কিন্তু পাঁচবছর পরও মাগুরামের কোন খবর না পেয়ে বানাশ্রী নিজের মনকে ধরে রাখতে পারেনি। আজকাল সে গরীব স্বামীর সঙ্গে থাকে। তার বাবা গাওঁবুড়া মৃত্যু পর্যন্ত মেয়ের মুখ না দেখার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

সকাল বেলায় আমি যখন পাইনউড হোটেল থেকে কাপড় পরে বের হই তখন আমার সুইটে মাগুরাম প্রবেশ করে। হাতে কোন একটা ব্যাগ ছিল।
‘কি হলো ভাই?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘বাবু, বানাশ্রীর খুব আকাল। তার স্বামী রিক্সা চালায়। এই টোপ্লায় আমার কামানো সমস্ত টাকা রয়েছে। যার জন্য এই টাকা রোজগার করেছি সে যখন চলে গেছে তখন এটা নিয়ে আমি কি করব? বাবু যদি ভালবেসে এটা বানাশ্রীকে দাও তাহলে খুব ভাল হয়।’

টোপ্লাটা আমার হাতে জোর করে ছেড়ে মাগুরাম তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে যায়। আমি কিছু বলার আগেই সে পাইনউড হোটেলের বাইরে চলে যায়।